Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ রাজিয়া সুলতানা

রোলঃ 228022013

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ রাজিয়া সুলতানা

রোলঃ 228022013

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছাঃ রাজিয়া সুলতানা, আইডিঃ 228022013 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

মোছাঃ রাজিয়া সুলতানা

আইডিঃ 228022013

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা: 5

আত্মশুদ্ধির স্তরসমূহ (নফসের অবস্থা) 5

আধ্যাত্মিকতার বিধান ও গুরুত্বঃ 6

আত্মার সৌন্দর্যঃ 8

আত্মার রোগঃ 8

নফসের সংঘাতঃ 9

তাসাউফ ও তাযকিয়ার ভূমিকা: 10

তাসাউফ কি: 10

তাসাউফের মূল উপাদান: 10

তাসাউফ ও শরীয়াহর সম্পর্ক : 11

আত্মশুদ্ধিতে তাসাউফের অবদান: 11

নিজের সঙ্গে সংলাপ 11

গোনাহের প্রভাব: 13

কুরআনের আলোকে নেককারদের সোহবত: আত্মশুদ্ধির খোরাক 17

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের কথা 19

সাহাবায়ে কেরামদের আত্মশুদ্ধি : 19

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা: 21

আত্মশুদ্ধির পথে বাধাসমূহ: 24

আত্মাকে কলুষমুক্ত করার উপায় সমূহ: 26

আত্মশুদ্ধির উপায় সমূহ : 26

আত্মশুদ্ধির উপায় ও অনুশীলন: 37

তাওবার প্রতি উৎসাহ এবং ইস্তিগফারের ফায়েদা 38

আত্মশুদ্ধির সুফল ও সমাজে এর প্রভাব: 40

আধুনিক জীবনে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা 42

আত্মশুদ্ধি ও আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে মুক্তি 44

আত্মশুদ্ধি ও ইখলাসপূর্ণ আমল 45

আত্মশুদ্ধি ও দোয়ার প্রভাব 47

উপসংহারঃ 48

গ্রন্থপঞ্জী : 48

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ভূমিকা:

নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য।আমরা তারই প্রশংসা করি, এবং তার কাছে সাহায্য চাই, তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর নিকট আমরা প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও আমাদের কর্ম সমূহের খারাবি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন তাকে গোমরাহ করার কেউ নেই আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তাকে হেদায়েত দেওয়ার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই তিনি একক তার কোন শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল ও তার বান্দা। দুরুদ ও সালাম নাযিল হোক তার ওপর তার পরিবার পরিজন ও তার সাহাবীদের উপর এবং যারা কিয়ামত অবধি এহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করেন তাদের উপর।

অতঃপর অযোগ্যতায় ভরা অধমের হাতে 'আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ' শিরনামে এক সংক্ষিপ্ত লিখনী নিম্নে উপস্থাপণ করার যথাযথ প্রয়াস লিপিবদ্ধ করলাম।

আত্মশুদ্ধির স্তরসমূহ (নফসের অবস্থা)

ইসলামী সূফিবাদ বা তাসাউফে আত্মার ৩টি মূল স্তর বা অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে:

1. নফসে আম্মারা (نَفْسِ أَمَّارَة) – পাপ প্রবণ আত্মা। এটি মানুষকে খারাপ কাজে প্ররোচিত করে।

2. নফসে লাওয়ামা (نَفْسِ لَوَّامَة) – তিরস্কারকারী আত্মা। পাপ করার পর অনুতাপ হয়।

3. নফসে মুতমাইন্না (نَفْسِ مُطْمَئِنَّة) – শান্ত আত্মা। আল্লাহর সন্তুষ্টিতে পরিপূর্ণ ও স্থির।

আধ্যাত্মিকতার বিধান ও গুরুত্বঃ

আল্লাহ তা'আলা যেভাবে নামায,রোযা,যাকাত ইত্যাদি বাহ্যিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিধান আমাদের উপর আবশ্যক করেছেন তেমনিভাবে অভ্যন্তরের সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিধানও আমাদের ওপর আবশ্যক করেছেন।অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত এ বিষয়গুলোর পরিশুদ্ধতা ব্যতিত বাহ্যিক আমল যেন অন্তঃসারশূন্য। যেমন:মানুষের অন্তরে ইখলাস থাকতে হবে,রিয়া থাকা যাবেনা।আল্লাহ ও রসুলের প্রতি মোহাব্বাত থাকতে হবে।কাজে নিয়্যাত স্পষ্ট থাকতে হবে ইত্যাদি।

অতঃপর যদি কোন পর্যবেক্ষণ আজ অধিকাংশ মানুষের অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে তিনি দেখতে পাবেন যে মানুষ বাহ্যিক বিষয় উন্নয়ণ,সুন্দর ও সজ্জিতকরণে অধিক যত্নবান ও মনোযোগী। একইসময়ে বাহ্যিক সজ্জিতকারণে ব্যতিব্যস্ত সে ব্যক্তিগুলো অভ্যন্তরীন বিষয়ের সজ্জিতকরণে ও তার শুদ্ধি ও সংশোধনিকরণে সম্পূর্ণ গাফেল, উদাসীন ও আগ্রহশূন্য।

এমনকি অনেক মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্য ও শোভা প্রকাশ ছাড়া অন্যকোন আগ্রহই দেখা যায় না।

মানুষের এ আচরণ যেন আল্লাহ পাকের বর্ণনা করা মুনাফিকদের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি:

وَاِذَا رَاَيۡتَهُمۡ تُعۡجِبُكَ اَجۡسَامُهُمۡ ؕ وَاِنۡ يَّقُوۡلُوۡا تَسۡمَعۡ لِقَوۡلِهِمۡ ؕ كَاَنَّهُمۡ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ يَحۡسَبُوۡنَ كُلَّ صَيۡحَةٍ عَلَيۡهِمۡ ؕ هُمُ الۡعَدُوُّ فَاحۡذَرۡهُمۡ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤۡفَكُوۡنَ

তুমি যখন তাদেরকে দেখ, তখন তাদের দেহাকৃতি তোমার কাছে বড় ভালো লাগে এবং তারা যখন কথা বলে তুমি তাদের কথা শুনতে থাক, তারা যেন (কোন কিছুতে) ঠেকনা দেওয়া কাঠ। তারা যে-কোন হাঁক-ডাককে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই (তোমাদের) শত্রু। তাদের ব্যাপারে সাবধান থাক। তাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করুন। তারা বিভ্রান্ত হয়ে কোন দিকে চলছে? [সুরা:আল-মুনাফিকুন:৪]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক আকার - আকৃতি ও ধনদৌলতের দিকে দৃস্টিপাত করেন না বরং তিনি লক্ষ্য করে থাকেন তোমাদের অন্তরের দিকে এবং তিনি তার আঙ্গুল দ্বারা বুকের বা অন্তরের দিকে ইশারা করলেন। [সহীহ মুসলিম]

ঈমান ও কুফরী এবং হিদায়াহ ও গোমরাহী,ভ্রষ্টতা ও সততার মূল হলো যা বান্দার অন্তরে সম্পন্ন হয়।

ইবন রজব রহ. বলেন:

"শারীরিক অধিক আমলের ওপরই শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নির্ভর করেনা বরং তা নির্ভর করে আল্লাহর জন্য খাটি ও বিশুদ্ধ নিয়ত এবং সুন্নত বা হাদিসের সঠিক অনুবর্তিতার মাধ্যমে এবং অন্তরের দ্বারা অধিক পরিচয় এবং তার আমলের মাধ্যমে।"

অতএব, ঈমানদারের ঈমান তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ের সংশোধন এবং তাঁর অন্তরের পবিত্রতা ও সুবাসিত করা ব্যতিত পরিপূর্ণ হতে পারেনা।

তাই বান্দার অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং অন্তর যদি নস্ট, কুৎসা ও নোংরা হয় তাহলে বাহ্যিক সৌন্দর্য ও উন্নয়ণ কোনই কাজে আসবেনা।

আত্মার সৌন্দর্যঃ

আত্মার সৌন্দর্য এক প্রশান্তির বিস্তীর্ন ছোঁয়া। এ সৌন্দর্য যেমন ব্যক্তিকে প্রশান্তিতে আষ্টেপৃষ্টে রাখে ঠিক তেমনই ভাবে চারপাশের পরিবেশকেও প্রভাবিত করে ব্যাপকভাবে।এ যেন এক সুবাসিত ফুলের সৌরভ যা সৌন্দর্যে ও ঘ্রানে অন্যন্য।

এ সৌন্দর্য প্রকাশ করবে বিনয়ের,সবর ও শোকরের।মানুষকে দেখানোর প্রবৃত্তি এ সৌন্দর্যের অংশ নয়।স্রস্টার সন্তুষ্টিই একমাত্র লক্ষ্য।

ইখলাস ও ত্বাকওয়ায় পরিপূর্ণ এক আত্মার রূপরেখা।

আত্মার রোগঃ

মানব দেহের ভিতরে একটি মাংসপিন্ড আছে, যা ভালো থাকলে গোটা শরীরই ভালো থাকে। আর এটি নষ্ট হয়ে গেলে বা বিকৃতি ঘটলে সমস্ত শরীরটাই নষ্ট হয়ে যায়। সেই মাংসপিন্ডটিই হলো 'কলব' [বুখারি :৫২]

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেভাবে রোগাক্রান্ত হয়, তেমনি কলবও রোগগ্রস্ত হয়। হাতের রোগ ধরতে, পায়ের রোগ চলতে, চোখের রোগ দেখতে, জিহ্বার রোগ কথা বলতে যেমন বাধা দেয়, তেমনি কলবের রোগ আল্লাহর হিদায়াত লাভে প্রভুর প্রতি সাক্ষাতের আশা পোষণ করতে, ভালো কাজে অগ্রসর হতে, ইবাদতে মনোনিবেশ করতে বাধা সৃষ্টি করে। এ ধরনের কলবে ঈমান ও মুনাফিকি উভয়টা থাকতে পারে। যদি ঈমান, ইখলাস, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, তাওয়াক্কুল দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহলে সুস্থ কলবের পর্যায়ে উন্নীত হয়। আবার যদি কুপ্রবৃত্তি, হিংসা, অহংকার,রিয়া শিরক, মন্দ কাজের দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহলে মৃত কলবের পর্যায়ে চলে যায়। কলবকে কলুষিত করা এ রোগগুলো হারাম।

স্বভাবগতভাবেই মানুষের নিষিদ্ধ কাজে আগ্রহ অত্যাধিক আর এ আগ্রহই তাকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।আত্মার পরিশুদ্ধিকরণে এ রোগগুলো সম্পর্কে সতর্কপদার্পণ অপরিহার্য।

নফসের সংঘাতঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

যারা আমার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালায়, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে উপনীত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে আছেন।

[সূরা : আনকাবুত ৬৯]

নিজের আমল আখলাক সঠিক করা,গোনাহ থেকে বাঁচা এবং নফসকে ভুল পথে যাওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য চেষ্টা করাকে মুজাহাদা বলে।যেই শক্তি মানুষকে কোন কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তাকে নফস বলে। জাগতিক স্বাদে অভ্যস্ত এ নফস শুধু বাহ্যিক স্বাদ আস্বাদনের জন্য বিলাসিতার দিকে ধাবিত করা তার স্বভাব।এমতাবস্থায় মানুষ যদি তার নফসকে স্বস্থানেই ছেড়ে দেয় এবং স্বাদ উপভোগে নিজেকে ব্যস্ত করে রাখে,নফসের প্ররোচনায় চলতে থাকে তাহলে একসময় পশুতে রুপান্তরিত হবে।কারণ নফসের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে একটি উপভোগ্যর স্বাদ গ্রহনের পরই আরেক উপভোগ্যর দিকে অগ্রসর হওয়া এবং এভাবে চলতে চলতে জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া। এ স্বাদ ও ভোগের কোন সীমা নেই মৃত্যু ব্যতীত,ধ্বংশ ব্যতীত।

ডা.আব্দুল হাই রহ. একটি শের পাঠ করতেন

"অন্তরে যেসব বাসনা জাগছে
তা ধ্বংস হোক,তা খুন হোক,
কিন্তু আমি তো এখন সংকল্প করেছি
আমার এ আত্মাকে তোমার উপযুক্ত বানাতেই হবে"

লাগামহীন এ নফসকে বাধ্যতার শিকল পরানোর প্রয়াসই তাযকিয়াতুন নফস।

তাসাউফ ও তাযকিয়ার ভূমিকা:

ইসলামে আত্মশুদ্ধির একটি সুসংহত ও গভীর শাখার নাম হলো তাসাউফ। এটি কেবল একটি আধ্যাত্মিক অনুশীলন নয়, বরং আত্মাকে গুনাহের গন্ধ থেকেও মুক্ত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সঠিক পন্থা। তাসাউফের মূল উদ্দেশ্যই হলো তাযকিয়া, অর্থাৎ আত্মার পরিশুদ্ধি। এর মাধ্যমে মানুষ বাহ্যিক আমলের পাশাপাশি অন্তরের বাস্তব রূপ পরিবর্তন করে—নফসের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে রবের আনুগত্যে প্রবেশ করে।

তাসাউফ কি:

ইমাম কুশায়রি (রহঃ) বলেন:

“তাসাউফ হচ্ছে—আল্লাহর প্রতি একান্ত ভালোবাসা ও ভরসার মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধি সাধন করা।”

অন্যদিকে ইমাম জুনায়দ বাগদাদী (রহঃ) বলেন:

“তাসাউফ হলো, আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় চলা যেন নিজের নফস, কামনা, ইচ্ছা সবকিছুই বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।”

তাসাউফের মূল উপাদান:

তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধির শিক্ষায় তিনটি মূল স্তর থাকে:

১. ইলমুল মুকাশাফা – অন্তরের জ্ঞানে উন্নতি

২. মুজাহাদা – নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

৩. মুরাকাবা ও ইখলাস – একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে জীবন গঠন

তাসাউফ ও শরীয়াহর সম্পর্ক :

অনেকেই ভুলভাবে মনে করেন, তাসাউফ শরীয়াহ-বহির্ভূত। কিন্তু প্রকৃত তাসাউফ কেবলমাত্র শরীয়াহের পরিপূর্ণ অনুসরণেই সম্ভব। আত্মশুদ্ধির জন্য নিয়মতান্ত্রিক ইবাদত, সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনযাপন ও আল্লাহভীতির গভীর অনুভূতির বিকাশ অপরিহার্য।
ইমাম রাব্বানী (রহঃ) বলেন:

"তাসাউফ ও শরীয়াহ—এই দুই যেন আত্মা ও শরীর। শরীর ছাড়া যেমন আত্মা পরিপূর্ণ হয় না, শরীয়াহ ছাড়া তাসাউফও ভ্রান্তিতে পরিণত হয়।"

আত্মশুদ্ধিতে তাসাউফের অবদান:

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তাসাউফের মাধ্যমে সমাজে এক বিশাল আত্মিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহর অলীরা—যেমন হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ), মঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ), খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (রহঃ) প্রমুখ—মানুষের অন্তরকে পরিবর্তন করে তাদের আল্লাহমুখী করেছেন।

নিজের সঙ্গে সংলাপ

আত্মশুদ্ধির পূর্বশর্ত আত্মোপলব্ধি:
একজন মানুষ তার চাহিদা অনুযায়ী, ব্যক্তিবিশেষে অতিরিক্ত অর্থসম্পদ করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তার সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয় সম্পদের পেছনে।দিনশেষে সে ভাবে এ সম্পদ তারই,এ বাড়ি,গাড়িসবকিছুই তারই উপার্জিত। এসবের মালিক একমাত্র সে।

কিন্তু এ সকল কিছু বহন করাকালীন অর্থাৎ আইন এবং যুক্তি মোতাবেক তা আয়ত্ত্বাধীন থাকা অবস্থাতেই যদি ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে যায় তবে এ সম্পদের মূল্য ঐ ব্যক্তির আর কোন কাজেই আসবেনা। মৃত্যুর অব্যবহিত পরই তা হস্তগত হবে কোনো ওয়ারিশের অথবা ব্যাংকের অথবা হবে ব্যবসায়িক অংশীদারের নতুবা সরকারের। এমন কোনো ব্যবস্থাই নেই যে, তাতে এগুলো ঐ ব্যক্তির সাথে তার কবরে যাবে। অথবা তার বিনিময়ে কবরে অথবা কবর পরবর্তী জীবনে কোনো লাভ অর্জিত হবে।

অতিব্যস্ত থেকে হয়তো বা নামায পরিহার করে অথবা মিথ্যা বলে ঘুষ কিংবা সুদের ভিত্তিতে এ ধন-সম্পদ অর্জিত হয়েছে। অর্জনকারী যে তাকেই এ অর্জনের সকল দায়ভার বহন করতে হবে। এই অর্জনের যারা ফল ভোগ করবে সেই অতি প্রিয় অতি আদরের পরিবার-পরিজন এই উপার্জন প্রক্রিয়ার কোনো দায় দায়িত্বই বহন করবে না। জীবদ্দশায় অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তা তাদের জন্য পুরাটাই বৈধ। তাদের জন্য বৈধ এ কারণেই যে ব্যক্তি এই অবৈধ উপার্জন করেছ নিতান্ত সংগোপনে। তাই প্রশ্ন, এই যদি হয় বাস্তবতা তবে আর নয় ভুল করা, শুধরে যাওয়াই শ্রেয়।

ধরে নেওয়া যাক উর্পাজনটা সঠিক ছিল তাতে কি? সে বৈধ উপার্জন যদি শুধুই মজুদ থাকে ব্যাংকে কিংবা ব্যবহৃত হয় উন্নত খাবার-দাবার, পোশাক-অলংকারাদি ক্রয়ে তাহলে শুধু ফায়দা হবে পৃথিবীর জীবনে, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধব বাহবা দেবে, সমাজে নাম প্রতিপত্তি হবে, আর মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথেই সকল সম্পদের মলিকানা চলে যাবে অন্য জনের কাছে।

এর অর্থ এই নয় যে, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বৈরাগ্য বেশ ধারণ করতে হবে। ইসলাম ধর্ম বিধানে বৈরাগ্যের কোনো স্থান নেই। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ‘তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠিত কর আর সালাতের পর জমীনে ছড়িয়ে পড় হালাল জীবিকার সন্ধানে।’

যে অর্থ সকল অনর্থের মূল সেই অর্থই হতে পারে ব্যক্তির পার্থিব জীবনের সুখের এবং জান্নাত যাবার বাহন। চালক যদি গতি নিয়ন্ত্রণে রেখে ট্রাফিক

আইন লঙ্ঘন না করে নিজের গাড়িটিকে পরিচালিত করে তবে মহান রবের দয়ায় সে নিরাপদ পৌছে যাবে গন্তব্যে। ঠিক তেমনি হালাল পথে উপার্জনে সচেষ্ট হতে হবে। হালাল উপার্জনকে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথে ব্যয় করতে হবে। নিজের পরিবারের একান্ত যৌক্তিক প্রয়োজনেও ব্যয় হবে।

কিছু সঞ্চয় থাকতেই পারে। অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হোক মানবতার কল্যাণে, দরিদ্রকে সাহায্য সহযোগিতা করায়, দ্বীনী শিক্ষা প্রচার প্রসারে। মহান রব পবিত্র কালামে পাকে আহবান করেছেন, 'কে আছ যে আমাকে উত্তম কর্জ দেবে?' আসুন সেই কাতারে শামিল হই। দান করা চাই মৃত্যু আসবার আগেই আর সেটাই আল্লাহর আদেশ।

গোনাহের প্রভাব:

জীবন চলতে গিয়ে মানুষকে নানা রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। নানা ধরনের কাজ—কর্ম করতে হয়। ভাবতে হয় নানা রকম বিষয় এবং সামলাতে হয় বিচিত্র রকমের পরিস্থিতি। এসব ক্ষেত্রে যথাযথ উদ্যোগ ও উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ যেমন হয়, তেমনি হয়ে যায় অনাকাঙ্ক্ষিত নানা ভুল ও বিচ্যুতি। মানুষের মানবিক ও প্রাকৃতিক নানা দুর্বলতাও প্রকাশ পায় সেখানে। প্রকাশ পায় তার আত্মশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তির বিভিন্ন অবস্থা। কোনো সন্দেহ নেই— এসবকিছু সত্ত্বেও জীবনের বহু ক্ষেত্রে মানুষ সফল হয়। তবে ব্যর্থতাও অধিকার করে নেয় বহু ক্ষেত্র। জীবনের এই ধারা চলমান। জীবন যতদিন আছে হয়তো ততদিনই চলবে এই অবস্থা।

কোনো মানুষই চায় না— তার জীবনে ব্যর্থতা নেমে আসুক। চায় না— তাকে দুঃখ স্পর্শ করুক কিংবা স্পর্শ করুক হতাশা ও দুশ্চিন্তা। কিন্তু অমোঘ বাস্তবতা রুখবে কে? তাই সফলতার পাশাপাশি মানুষকে ব্যর্থতাও দেখতে হয়। সুখের সাথে মেনে নিতে হয় দুঃখকেও। না চাইলেও সয়ে যেতে হয় দুর্দশা ও দুশ্চিন্তা।

জীবনের এইসব ক্ষেত্রে মানুষ সবসময়ই যে নীতি-আদর্শে অবিচল থাকতে পারে— এমন নয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে সে সরে যায় করণীয় থেকে। লিপ্ত হয়ে পড়ে নিষিদ্ধ কিংবা অনুচিত নানা কাজে। এক্ষেত্রে মানুষের স্বভাব দুর্বলতা তো আছেই। আরও আছে গাফলত ও অবহেলা, প্রবৃত্তি ও মন্দপ্রবণতা, আছে দৃঢ়তা ও অবিচলতার অভাব। উপরন্তু ইবলিস শয়তান তো আছেই। আছে তার ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণতা।

মানুষের এইসকল অবস্থা, স্বভাবজাত দুর্বলতা, অবহেলা, মন্দপ্রবণতা ও শয়তানের কুমন্ত্রণার কথা খুব ভালোভাবেই জানেন তিনি, যিনি সকলের খালিক ও স্রষ্টাএবং মালিক ও সর্বাধিকারী। তাই খুব সহজ ও সুন্দর প্রতিবিধানের ব্যবস্থা রেখেছেন তিনি। দিয়েছেন উদ্ধারকারী সহজ মাধ্যম এবং প্রতিষেধমূলক সহজ প্রক্রিয়া।

কুরআন মাজীদের বেশ কয়েকটি আয়াতে খুব স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে সে বিষয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْن.َ

মানুষ নিজ হাতে যা কামাই করেছে, তার কারণে জলে—স্থলে ছড়িয়ে পড়েছে বিপর্যয়, যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কিছুটা শাস্তি আস্বাদন করান, যেন তারা (সৎপথে) ফিরে আসে। Ñসূরা রূম (৩০) : ৪১

অর্থাৎ মানুষের জীবনে যেসব বিপদ ও মসিবত এবং দুর্যোগ ও দুর্দশা আসে সেগুলো তারই কৃতকর্মের ফল; গোনাহ ও পাপাচারের পরিণতি।

অন্য আয়াতে আরও স্পষ্টভাবে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ لَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰي دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْن. َ

আর আমি তাদেরকে (জাহান্নামের) সেই বড় শাস্তির আগে অবশ্যই লঘু শাস্তির স্বাদও গ্রহণ করাব। হয়তো তারা ফিরে আসবে। —সূরা সাজদা (৩২) : ২১

এখানে الْعَذَابِ الْاَدْنٰي (লঘু শাস্তি) বলে দুনিয়াবী শাস্তি তথা রোগ-শোক, আপন-বিপদ ও বালা-মসিবতকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ গোনাহের কারণে

আখেরাতের শাস্তি তো আছেই; দুনিয়াতেও বিভিন্ন ধরনের বালা-মসিবতের মাধ্যমে সেই গোনাহের শাস্তি দেওয়া হবে। —দ্রষ্টব্য, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৬/৩৬৯

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

وَ مَاۤ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِیْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَیْدِیْكُمْ وَ یَعْفُوْا عَنْ كَثِیْرٍ. ؕ

তোমাদের উপর যে মসিবত আসে, তা তোমাদেরই হাতের কর্মের ফলে। আর তিনি তোমাদের অনেক কিছুই (অপরাধ) ক্ষমা করে দেন। —সূরা শূরা (৪২) : ৩০

বোঝা গেল, অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়ার পর আরও যা কিছু রয়ে যায় সেগুলোর কারণেও বিভিন্ন ধরনের বিপদ-মসিবত আসে। অর্থাৎ কৃত গোনাহ ও অপরাধের সবগুলোর জন্য বান্দা হয়তো তাওবা-ইস্তিগফার করেনি; অথবা করেছে, কিন্তু তার সব তাওবা কবুল হয়নি।

এ বিষয়ে ‘তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন’ থেকে একটি টিকা তুলে ধরছি। হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম লেখেন—

দুনিয়ায় যে ব্যাপক বালা-মসিবত দেখা দেয়, যেমন দুর্ভিক্ষ, মহামারি, ভূমিকম্প, শত্রুর আগ্রাসন, জালিমের আধিপত্য ইত্যাদি, এসবের প্রকৃত কারণ ব্যাপকভাবে আল্লাহ তাআলার হুকুম অমান্য করা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া। এভাবেই এসব বিপদাপদ মানুষের আপন হাতের কামাই হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর এসব বিপদাপদ চাপান এজন্য, যাতে মানুষের মন কিছুটা নরম হয় এবং দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়। প্রকাশ থাকে যে, দুনিয়ায় যেসব বিপদাপদ দেখা দেয়, অনেক সময় তার বাহ্যিক কারণও থাকে, যা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী আপন কার্য প্রকাশ করে। কিন্তু এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই কারণও আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি এবং বিশেষ সময় ও বিশেষ স্থানে তার সক্রিয় হওয়াটাও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি নিজের সে ইচ্ছা সাধারণত মানুষের পাপাচারের ফলেই কার্যকর করেন। এভাবে এ আয়াত শিক্ষা দিচ্ছে, সাধারণ বালা-মসিবতের সময় নিজেদের গোনাহের কথা স্মরণ করে আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা ও

ইস্তিগফারে লিপ্ত হওয়া চাই, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তা বাহ্যিক কোনো কারণঘটিত বিষয়। —তাওযীহুল কুরআন, সূরা রূম (৩০) : ৪১

উল্লিখিত একটি আয়াতে যেমন ছোট বড় গোনাহের প্রসঙ্গ এসেছে, অন্য একটি আয়াতে এসেছে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য গোনাহের কথা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

َوَ ذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَ بَاطِنَهٗ اِنَّ الَّذِیْنَ یَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَیُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا یَقْتَرِفُوْن.

তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন সকল গোনাহ ছেড়ে দাও। যারা গোনাহ করে, শীঘ্রই তাদেরকে তাদের কৃত গোনাহের কারণে শাস্তি দেওয়া হবে। —সূরা আনআম (৬) : ১২০

প্রকাশ্য গোনাহ হল সেইসব গোনাহ, যা মানুষ তার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা করে। যেমন, মিথ্যা বলা, গীবত করা, ধোঁকা দেওয়া ইত্যাদি। আর গোপন গোনাহ হল সেইগুলো, যা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন হিংসা, বিদ্বেষ, রিয়া, অহংকার ইত্যাদি।

আয়াতে উভয় প্রকার গোনাহের শাস্তি শীঘ্রই দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আরেকটি আয়াতে ভয়ানক সতর্কবার্তা উল্লেখিত হয়েছে। পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকে তাদের কৃত অন্যায় ও অপরাধের কারণে যেভাবে পাকড়াও করা হয়েছে, তাদের বর্তমান উত্তরসূরিকেও সেটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সাথেও এমনটি ঘটতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে—

اَوَ لَمْ یَهْدِ لِلَّذِیْنَ یَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَاۤ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَ نَطْبَعُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا یَسْمَعُوْن.َ

যারা কোনো ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের (ধ্বংসপ্রাপ্তির) পর তার উত্তরাধিকারী হয়, তাদের কি এই শিক্ষা লাভ হয়নি যে, আমি চাইলে তাদেরকেও তাদের গোনাহের কারণে পাকড়াও করতে পারি?এবং (হঠকারিতাবশত এ শিক্ষা গ্রহণ না করার কারণে) আমি তাদের অন্তরে মোহর করে দিতে পারি, ফলে তারা (কোনো কথা) শুনতে পাবে না? —সূরা আরাফ (৭) : ১০০

কোনো গোনাহ্ করার সময় কি মনে থাকে একথা? উপলব্ধির সাথে একথা মনে রাখতে পারলে বাস্তবেই গোনাহ করা অনেক কঠিন হয়ে যাবে। এখানে গোনাহের শাস্তির কথা তো আছেই, আরও আছে হঠকারিতাবশত এ শিক্ষা গ্রহণ না করার কারণে অন্তর মোহরাঙ্কিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সবাইকে এমন বিষয় থেকে রক্ষা করুন।

কুরআনের আলোকে নেককারদের সোহবত: আত্মশুদ্ধির খোরাক

হাফেজ্জী হুজুর রহ. এর মজলিসের সারমর্ম থেকে সংকলিত :

সূরা ফুরকানে আল্লাহ বলেছেন,

وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ۝٢٧ يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ۝٢٨ لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ؕ وَ كَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا

‘জালেম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, আফসোস! আমি যদি রাসূলের সঙ্গে পথ ধরতাম। হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিচ্যুত করেছিল! শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে পরিত্যাগ করেই থাকে।’ -সূরা ফুরকান ২৭-২৯

সে দিনটি কোন দিন

কুরআনে এদিনের কথাই বারবার বলা হয়েছে। সূরা ফাতিহায় এসেছে, ‘হিসাব দিবসের মালিক।’ সেদিন কিয়ামত হবে, হিসাব-নিকাশ হবে। সূরা তাকাসুরে এসেছে, ‘সেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।’ অন্য আয়াতে এসেছে, ‘সেদিন তাদের মুখে সিল মেরে দেওয়া হবে।’ যবান কথা বলতে পারবে না। সেদিন আল্লাহর সঙ্গে তাদের হাতগুলো কথা বলবে আর তাদের পা গুলো সাক্ষ্য দিবে। -সূরা ইয়াসীন ৬৫

এ আয়াতে পা সাক্ষ্য দেওয়ার কথা এসেছে। অন্য জায়গায় চোখ, কান ও ত্বকের সাক্ষ্যদানের কথা এসেছে। সূরা হা-মীম সাজদায় বলা হয়েছে, “যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে এবং তাদের বিন্যস্ত

করা হবে বিভিন্ন দলে, তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে । তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু ও তোমাদের ত্বক তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে না- এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কোনো কিছু গোপন করতে না। তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না।” -সূরা হা-মীম সাজদা ১৯-২২

গোটা কুরআনে একটিই কথা, ওইদিন আসবে। অতএব তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। কবে আসবে সে প্রশ্নের প্রয়োজন নেই। প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকাই হল মানুষের কাজ। যখন সময় হবে তখন তা অবশ্যই উপস্থিত হবে। তখন দুনিয়ার জীবন খুব তুচ্ছ মনে হবে। কুরআনে এসেছে, “তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কিয়ামত কখন হবে? এর বর্ণনার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক? এর পরম জ্ঞান আপনার পালনকর্তার কাছে রয়েছে। যে একে ভয় করে আপনি তো কেবল তাকে সতর্ক করবেন। যেদিন তারা একে দেখবে সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অতিবাহিত করেছে।” -নাযিআত ৪২-৪৬

অন্যত্র এসেছে ‘তারা বলে, এ ওয়াদা কখন আসবে যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক? -সূরা ইউনুছ ৪৮

অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা এসব অবান্তর প্রশ্ন করে আখেরাতকে ভুলে থাকতে চায়। সূরা মুলকের এক আয়াতে এর সুন্দর জবাব আছে যে, (হে নবী) “আপনি বলুন, এর ইলম তো আল্লাহর কাছে রয়েছে। আর আমি তো শুধু স্পষ্টভাবে সর্তককারী”। তাহলে আল্লাহ তাঁর সর্বশ্রেষ্ট ও সর্বশেষ রাসূলকে দিয়ে এ কথা বলিয়েছেন যে, কেয়ামত কবে সংঘটিত হবে তার ইলম একমাত্র আল্লাহর কাছেই আছে। বান্দার কাজ হল কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এ প্রস্তুতি মৃত্যু আসার আগেই নিতে হবে। অন্যথায় আফসোস করতে হবে।

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের কথা

জাহান্নামীরা সেদিন কী বলে আফসোস করবে তা কুরআন মজীদে বলা হয়েছে। অন্যদিকে জান্নাতীদের খুশির কথা, কী বলে তারা আনন্দ প্রকাশ করবে তা-ও আল্লাহ বলেছেন। আমাদের হাফেজ্জী হুজুর খুশির কথা বেশি বলতেন। জান্নাতীরা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের দুঃখ দূর করেছেন। নিশ্চয় আমাদের পালনকর্তা বড় ক্ষমাশীল, বড় গুণগ্রাহী।' -সূরা ফাতির ৩৪

অর্থাৎ তিনি আমাদের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। সামান্য আমলের বদলে কত নিয়ামত আমাদের দান করেছেন।

সাহাবায়ে কেরামদের আত্মশুদ্ধি :

সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ছিলেন এমন এক শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম, যাদের আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য আল্লাহ ও রাসূল (সা.) সরাসরি তাদেরকে গাইড করেছেন। তাঁরা শুধু বাহ্যিক আমলে সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং অন্তরের শুদ্ধি, নিয়তের বিশুদ্ধতা, অহংকারমুক্তি এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির সর্বোচ্চ মানদণ্ড স্থাপন করেছিলেন।

১. হযরত আবু বকর (রাঃ) – বিনয় ও কৃতজ্ঞতার প্রতীক
খিলাফতের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েও তিনি বলতেন:
"আমার ভাইয়েরা! আমি তোমাদের ওপর শাসক নই, বরং তোমাদের একজন খাদেম।"
এমন নিঃস্বার্থতা এবং অহংকারশূন্যতা তাঁর গভীর আত্মশুদ্ধির পরিচায়ক।

২. হযরত ওমর (রাঃ) – আত্মসমালোচনার আদর্শ
তিনি বলতেন:

“তোমরা হিসাব চাওয়ার আগেই নিজেদের হিসাব নাও, এবং আমল তুলা হবে সেই দিন আসার আগেই নিজেদের আমল যাচাই করো।”
(তাযকিয়া ও আত্মসমালোচনার এমন নির্দেশ এক গভীর আত্মশুদ্ধির চেতনা থেকেই আসে।)

৩. হযরত উসমান (রাঃ) – লজ্জাশীলতার প্রতীক
রাসূল (সা.) বলেন:
“আমি এমনকি ফেরেশতাগণও উসমানের লজ্জাশীলতার সামনে লজ্জাবোধ করি।”
— (সহীহ মুসলিম)
এই লজ্জাশীলতা ছিল তাঁর আত্মার পরিশুদ্ধতার ফল।

৪. হযরত আলী (রাঃ) – গভীর আত্মজ্ঞান ও সৎচরিত্র
তিনি বলতেন:
“নিজেকে জানো, তাহলেই তোমার প্রভুকে চিনতে পারবে।”
তিনি গভীর আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির চর্চা করতেন, এবং তাঁর কথায় ও আচরণে আল্লাহভীতির গভীর ছাপ থাকত।

৫. সাহাবীদের দুনিয়া বিমুখতা ও আত্মসংযম
অনেক সাহাবী ছিলেন প্রচুর ধনী, কিন্তু তাঁদের জীবন ছিল দুনিয়ার মোহমুক্ত। তাঁরা আত্মাকে দুনিয়াপ্রীতি, হিংসা, অহংকার ইত্যাদি থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) একটি পাথরের বালিশে ঘুমাতেন, বলতেন:
“আমি দুনিয়াতে একজন পথচারীর মতো, সামান্য ছায়া নিয়ে আবার রওনা হয়ে যাব।”

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা:

আত্মশুদ্ধির বা তাজকিতুন নফস ধারণাটি ইসলামী শিক্ষার অন্তর্নিহিত, যা আধ্যাত্মিক পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব এবং একজনের চরিত্রের ক্রমাগত উন্নতির উপর জোর দেয়। এটি ইসলামী বিশ্বাসের একটি মৌলিক দিক, যা মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ শান্তি, ধার্মিকতা এবং তাদের সৃষ্টিকর্তার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অর্জনের দিকে পরিচালিত করে।আত্ম-শুদ্ধি আত্মদর্শন এবং একজনের চিন্তা, উদ্দেশ্য এবং কর্মের গভীর পরীক্ষার মাধ্যমে শুরু হয়। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে মানুষের আত্মা ভালো এবং মন্দ উভয়ের জন্যই প্রবণ, এবং প্রতিটি বিশ্বাসীর কর্তব্য তাদের আত্মাকে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য এবং আবেগ থেকে পরিশুদ্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা করা।

তাজকিয়াতুন নফসের বা আত্ম-শুদ্ধির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে মানুষের চরিত্র থেকে অহংকার, লোভ, হিংসা এবং ক্রোধের মতো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি শনাক্ত করা এবং কীভাবে তা অপসারণ করা যায় তাদের ইসলামের শিক্ষার সাথে সারিবদ্ধ করে দিকনির্দেশনা দেয়। অর্থাৎ তাজকিয়াতুন নফসের বা আত্ম-শুদ্ধির চূড়ান্ত লক্ষ্য হল অভ্যন্তরীণ শান্তি, তৃপ্তি এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌পাক বলেন, 'সেই সফল হয়েছে যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে' (সূরা আশ-শামস, (৯১:৯), এ আয়াতে কালিমায় ইসলামে পবিত্রতাকে যে উচ্চ মর্যাদার সাথে বিবেচনা করা হয় তার উপর জোর দেয়।

ইসলামে আত্মশুদ্ধির একটি প্রাথমিক পদ্ধতি হল আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্ম-শৃঙ্খলা অনুশীলনের মাধ্যমে। মুসলমানদের প্রলোভন প্রতিরোধ করতে, পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে এবং পুণ্যময় আচরণের জন্য সচেষ্ট হতে উৎসাহিত করা হয়। রসুলে পাক মুহাম্মাদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারাই যার আচার-আচরণ ও চরিত্র সর্বোত্তম।' এটি ধৈর্য, সততা, নম্রতা এবং ক্ষমার মতো মহৎ গুণাবলী গড়ে তোলার তাৎপর্যকে তুলে ধরে, যা আত্মার পরিশুদ্ধির দিকে পরিচালিত করে, নামাজ, কুরআনে তেলওয়াত, রাসূলে পাক

সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানা, তাঁর প্রতি নি:শর্ত ভালোবাসা, এবং তাঁর আদর্শগুলোকে নিজের আত্মজীবনের কর্মের প্রতিটা ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করা, নিজের সম্পদের কিছু অংশ দাতব্যর কাজের ব্যয়ে অংশীদারিত্ব হওয়া এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সান্নিধ্য থেকে তাঁদের আচরণকে অনুসরণ করা আত্মশুদ্ধির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আমাদের জন্য ফরজ করা হয়েছে যা ইসলামে আত্মশুদ্ধির একটি অত্যাবশ্যক রূপ। মুসলমানরা দৈনিক পাঁচটি প্রার্থনায় নিযুক্ত থাকে, যার সময় তারা আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা, নির্দেশনা এবং শুদ্ধি কামনা করে। এটি আল্লাহপাকের সাথে সংযোগ স্থাপন, কর্মের প্রতিফলন এবং যেকোনো অপরাধের জন্য অনুতাপ চাওয়ার উপায় হিসেবে কাজ করে। প্রার্থনার মাধ্যমে, মুসলমানরা ক্রমাগত ধার্মিকতার প্রতি তাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এবং তাদের হৃদয় ও মনকে পরিশুদ্ধ করে।

উপরন্তু, কুরআন তেলাওয়াত আত্মশুদ্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোরআন আল্লাহর বাণী বলে বিশ্বাস করে এর আয়াতে নির্দেশিকা, প্রজ্ঞা এবং শিক্ষা রয়েছে যা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। কোরআানের সাথে নিয়মিত সম্পৃক্ততা মুসলমানদের আধ্যাত্মিক পুষ্টি, চিন্তার স্বচ্ছতা এবং তাদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি অর্জনে সহায়তা করে। কোরআনে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই, এই কোরআন সেই দিকেই পথ দেখায় যা সবচেয়ে উপযুক্ত এবং যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য সুসংবাদ দেয়' (সূরা আল-ইসরা-১৭ :৯)।

রাসূলে পাক সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানা, তাঁর প্রতি নিঃশর্ত ভালোবাসা, এবং তাঁর আদর্শগুলোকে নিজের আত্মজীবনের কর্মের প্রতিটা ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করা আত্মশুদ্ধি অর্জনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর হাবীবের চরিত্রকে সর্বোচ্চ মর্যদায় অধিষ্ঠিত করে কোরআনে পাকে সূরা আল-কালামের ৪ নম্বর আয়াতে বলেছেন 'আপনি অবশ্যই সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী'।

রসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া–সহানুভূতি, দৈর্য্য–অধ্যবসায়, ক্ষমা–করুণা, নম্রতা–বিনয়ী এবং সততার অনুসরণ মানুষকে আত্মশুদ্ধি চর্চায় বড়ো ভূমিকা পালন করে। দান এবং দয়ার কাজগুলি ইসলামে আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়াতেও অবদান রাখে। যারা প্রয়োজনে তাদের দান করে এবং সম্প্রদায়ের সেবা করে, মুসলমানরা সহানুভূতি এবং নিঃস্বার্থতার অনুভূতি বিকাশ করে। এই অভ্যাসটি স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষা পরিশুদ্ধ করতে এবং অন্যদের মঙ্গলের জন্য প্রকৃত উদ্বেগ প্রচার করতে সাহায্য করে। নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, বিলম্ব না করে দান কর, কেননা তা বিপদের পথে দাঁড়ায়।

আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাদের সান্নিধ্য থেকে তাঁদের আদর্শকে অনুসরণ করা আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়াতে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ আল্লাহ এবং রসূলের সংজ্ঞায়িত বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে যে ব্যক্তিদের নিকটবর্তী হওয়া যারা আল্লাহ্‌পাকের আশীর্বাদপুষ্ট বান্দা (আউলি আল্লাহ) হিসাবে পরিচিত এবং তাদের আদর্শ (তাকফির আল–আকদ) অনুসরণ করা।

ইসলামে, আউলি আল্লাহ হলেন এমন ব্যক্তি যারা আল্লাহর নৈকট্য এবং তাদের অনুকরণীয় জীবনের জন্য পরিচিত করে আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছেছে। আধ্যাত্মিকতা অর্জন আল্লাহর পথের প্রতি অঙ্গীকার প্রদর্শন করেছে। এই বরকতময় বান্দাদের আদর্শ এবং শিক্ষা অনুসরণ করে, আল্লাহর নিকটবর্তী হতে পারে এবং তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারে। আউলি আল্লাহকে মুসলমানদের অনুসরণ করার জন্য রোল মডেল হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং তাদের আচরণ এবং শিক্ষা, অনুপ্রেরণা, নির্দেশনা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের উন্নত জীবন গঠনে একটি বড় উৎস।

পরিশেষে বলা যায় আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে আত্মশুদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর মাধ্যম, ইসলাম ধর্মে আত্মশুদ্ধির অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকার মাধ্যমে, ব্যক্তিরা তাদের ক্রিয়া, আবেগ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি উচ্চতর সচেতনতা বিকাশ করে, তাদের আরও ধার্মিক এবং পরিপূর্ণ জীবন যাপন করতে সক্ষম করে। শেষ পর্যন্ত,

ইসলামে আত্মশুদ্ধি একটি অভ্যন্তরীণ শান্তি, তৃপ্তি এবং ঐশ্বরিকতার সাথে একটি দৃঢ় সংযোগের অবস্থা অর্জনে অবদান রাখে।

আত্মশুদ্ধির পথে বাধাসমূহ:

আত্মশুদ্ধি একটি দীর্ঘ, ধারাবাহিক এবং কঠিন পথ। এ পথে চলতে গিয়ে মানুষ বিভিন্ন মানসিক, পারিপার্শ্বিক এবং শয়তানি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। এই বাধাগুলো চিহ্নিত করে যথাযথ উপায়ে তা অতিক্রম করতে পারলেই একজন মুমিন আত্মশুদ্ধির সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারেন।

১. নফসের প্রলোভন (نفس)

নফস সব সময় পাপ, লালসা, অলসতা ও গাফলতির দিকে ধাবিত করে। কুরআনে বলা হয়েছে:

"নিশ্চয়ই নফস মানুষকে মন্দ কাজের আদেশ দেয়।"

— (সূরা ইউসুফ, ১২:৫৩)

প্রতিকার:

নফসের বিরুদ্ধে মুজাহাদা (সংগ্রাম) করা

অভ্যাসগত নিয়ন্ত্রণ (যেমন: কম খাওয়া, কম ঘুম, নিরবতা চর্চা)

২. শয়তানের কুমন্ত্রণা

শয়তান মানুষকে ধোঁকায় ফেলে আত্মশুদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কুরআন জানায়:

"সে (শয়তান) বলেছিল, আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব।"

— (সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৬)

প্রতিকার:

সর্বদা আউযুবিল্লাহ... পড়ে আল্লাহর আশ্রয় নেওয়া
দোয়া, যিকির ও কুরআন তিলাওয়াত

৩. দুনিয়ার মোহ
দুনিয়ার প্রতি অতিমাত্রায় আসক্তি আত্মশুদ্ধির অন্যতম বড় বাধা। রাসূল (সা.) বলেন:
"প্রকৃত দুনিয়াপ্রেম সকল গোনাহের শিকড়।"
— (বায়হাকি)
প্রতিকার:
দুনিয়াকে প্রয়োজন মাত্র গ্রহণ করা
দান ও ইখলাসের মাধ্যমে দুনিয়াপ্রীতি কমানো

৪. খারাপ সঙ্গ
নফস ও শয়তানের পাশাপাশি খারাপ বন্ধু বা পরিবেশও আত্মশুদ্ধির বড় বাধা। কুরআনে এসেছে:
"হায়! যদি অমুককে আমি বন্ধু না বানাতাম!"
— (সূরা ফুরকান, ২৫:২৮)

প্রতিকার:
নেককার, আল্লাহভীরু বন্ধু নির্বাচন
দ্বীনদার পরিবেশে সময় অতিবাহিত করা (মসজিদ, দ্বীনি মজলিস)

৫. অহংকার, রিয়া ও হিংসা
এই রোগগুলো অন্তরের ভেতরের শত্রু, যা আত্মশুদ্ধিকে গিলে খায়। রাসূল (সা.) বলেন:
"রিয়া ছোট শিরক।"
— (মুসনাদে আহমাদ)

প্রতিকার:
নিজের সীমাবদ্ধতা ও গুনাহর স্মরণে বিনয়ী থাকা
প্রতিদিন নিয়ত বিশুদ্ধ করা
হিংসার বিরুদ্ধে দোয়া ও কৃতজ্ঞতার চর্চা

আত্মাকে কলুষমুক্ত করার উপায় সমূহ:

"সফল হয় সেই ব্যক্তি যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে'। 'এবং ব্যর্থ হয় সেই ব্যক্তি যে তার আত্মাকে কলুষিত করে' (শাম্স ৯১/৯-১০)"

ইতিপূর্বে বর্ণিত সূর্য, চন্দ্র, দিবস, রাত্রি, আকাশ, পৃথিবী ও মানুষসহ আটটি সৃষ্টবস্তুর শপথ করার পর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ উপরোক্ত কথা বলেছেন। এর দ্বারা তিনি অত্যন্ত জোরালোভাবে একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, পবিত্র আত্মার লোকেরাই পৃথিবীতে সফলকাম এবং কলুষিত আত্মার লোকেরা সর্বদা ব্যর্থকাম। তাদের বাহ্যিক পোষাক-পরিচ্ছদ যতই পবিত্র হৌক এবং সামাজিক মর্যাদা যতই উন্নত হৌক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُم 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা বা মালের দিকে দেখেন না। বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে' [সহিহ মুসলিম]

আত্মশুদ্ধির উপায় সমূহ :

(১) সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা : আল্লাহ মানুষের ও বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, তিনিই আমাদের রূযীদাতা, রোগ ও আরোগ্যদাতা, জীবন ও মরণদাতা, এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে পোষণ করা। তিনি যেমন মহা ক্ষমাশীল, তেমনি দ্রুত প্রতিশোধ গ্রহণকারী, এ আকাংখা ও ভয় সর্বদা লালন করা। সাথে সাথে প্রতিটি কর্মের হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে, সর্বদা এ দায়িত্বানুভূতি

জাগরুক থাকা। আল্লাহ বলেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দু’টি জান্নাত’ *(রহমান ৫৫/৪৬)*। তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন যারা আল্লাহভীরু এবং যারা সৎকর্মশীল’ *(নাহল ১৬/১২৮)*। অর্থাৎ যারাই আল্লাহভীরু তারাই সৎকর্মশীল। এর বিপরীত হওয়া সম্ভব নয়। অত্র আয়াতে আরেকটি বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহভীরুতা প্রমাণিত হবে কর্মের মাধ্যমে, কেবল কথার মাধ্যমে নয়।

২) সকল ক্ষেত্রে অহি-র বিধান মেনে চলা : আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ‘রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো’ *(হাশর ৫৯/৭)*। আর তিনি কোন কথা বলেন না আল্লাহর ‘অহি’ ব্যতীত *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। আল্লাহ বলেন, ‘যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল’ *(নিসা ৪/৮০)*। তাই হাদীছ বাদ দিয়ে কুরআন মান্য করার দাবী স্রেফ আত্মপ্রতারণা মাত্র। বস্ত্ততঃ তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে আত্মাকে কলুষমুক্ত রাখার সর্বোত্তম উপায়। কারণ ইসলামের সকল বিধান আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে নির্ধারিত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ، إِلا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، وَإِنَّ الرُّوحَ الأَمِينَ نَفَثَ فِي رُوعِي، أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللهَ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللهِ، فَإِنَّهُ لا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلا بِطَاعَتِهِ ‘হে জনগণ! তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে, এমন সকল বিষয় আমি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছি। পক্ষান্তরে তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে এবং জান্নাত থেকে দূরে রাখে, এমন সকল বিষয় আমি তোমাদের নিষেধ করেছি। আর আল্লাহ আমার প্রতি ‘অহি’ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি তার রূযী পূর্ণ না করা পর্যন্ত কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব সাবধান! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুন্দর পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ কর। আর জীবিকা আসতে দেরী

দেখে আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তোমরা তা অন্বেষণ করো না। কেননা আল্লাহর নিকটে যা রয়েছে তা তাঁর আনুগত্য ভিন্ন পাওয়া যায় না’।[বায়হাক্বী] অত্র হাদীছে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহর দেওয়া পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। যেমন ছালাত-ছিয়াম-হজ্জের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন, যাকাত আদায় ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের মাধ্যমে মালশুদ্ধি অর্জন ও নফল ইবাদত সমূহের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। মানুষের মনগড়া ছয় লতীফার যিকর বা ক্বলব ছাফ করার নামে নানাবিধ মা‘রেফতী কলা-কৌশলের মাধ্যমে নয়। এগুলি মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের করে শয়তানের আনুগত্যে বন্দী করে। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত ঐসব বন্দীশালা থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে পারে না। অতএব ঈমানদারগণ সাবধান!

যদি মানুষ আখেরাতে বিশ্বাসী না হয় এবং আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহিকে ভয় না করে, তাহ’লে তার কাছে মানুষ ও মানবতা নিরাপদ থাকে না। সে হয় স্রেফ প্রবৃত্তিপূজারী একটি বস্তুবাদী জীব মাত্র। আল্লাহ বলেন, فَالَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُوْن ‘যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর হয় হঠকারী এবং তারা হয় গর্বোদ্ধত’ *(নাহল ১৬/২২)*। তিনি বলেন, فَأَمَّا مَنْ طَغَى- وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا- فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى- وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى- فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ‘যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে’ ‘এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়’ ‘জাহান্নাম তার ঠিকানা হবে’। ‘পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং নিজেকে প্রবৃত্তিপূজা থেকে বিরত রাখে’ ‘জান্নাত তার ঠিকানা হবে’ *(নাযে‘আত ৭৯/৩৭-৪১)*।

(৩) মন্দ কাজের শাস্তি সম্পর্কে জানা ও তা সর্বদা স্মরণ করা : আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيم ‘তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদেরকে একে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছেন। যাতে তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন,

তাতে পরীক্ষা নিতে পারেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তি দানকারী এবং নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আন'আম ৬/১৬৫)*।

মানুষের অন্তর মন্দপ্রবণ। আর যে কাজে তাকে নিষেধ করা হয়, সে কাজের প্রতি সে প্রলুব্ধ হয়। ফলে সে সর্বদা ছোট-বড় পাপ করতেই থাকে। সবল শ্রেণী পাপ করেও পার পেয়ে যায়। ফলে তারা আরও পাপে উৎসাহিত হয়। দুর্বল শ্রেণী লঘু পাপে গুরুদন্ড পায়। আবার অনেক সময় বিনা পাপে দন্ড ভোগ করে। ফলে মন্দ কাজের শাস্তি না পেয়ে সবল শ্রেণী যেমন উদ্ধত হয়। তেমনি বিনা দোষে শাস্তি পেয়ে দুর্বল শ্রেণী হতাশ হয় এবং প্রায়ই তার ক্ষুব্ধ বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাতে সমাজে হিংসা ও প্রতিহিংসার আগুন তীব্র আকার ধারণ করে। তাই হতাশাগ্রস্ত মানুষকে আল্লাহ দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের বিপরীতে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। যেখানে যালেম তার যথাযথ শাস্তি পাবে এবং মযলূম তার যথার্থ পুরস্কার পাবে।

কিয়ামতের দিন মন্দ কাজের শাস্তি কিরূপ হবে, সে বিষয়ে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি হাদীছ নিম্নে উল্লেখিত হ'ল।-

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন বললেন, তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সবাই বলল, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি যার কোন টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়া থেকে ছালাত-ছিয়াম-যাকাত ইত্যাদি আদায় করে আসবে। সাথে ঐসব লোকেরাও আসবে, যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কারু উপরে অপবাদ দিয়েছে, কারু মাল গ্রাস করেছে, কাউকে হত্যা করেছে বা কাউকে প্রহার করেছে। তখন ঐসব পাওনাদারকে ঐ ব্যক্তির নেকী থেকে পরিশোধ করা হবে। এভাবে পরিশোধ করতে করতে যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তখন ঐসব লোকদের পাপসমূহ এই ব্যক্তির উপর চাপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'। তিনি বলেন, 'কিয়ামতের দিন প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য হক বুঝে দেয়া হবে'[সহিহ মুসলিম]

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের প্রতি যুলুম করেছে তার সম্মান বা অন্য কোন বিষয়ে, সে যেন আজই তার নিকট থেকে তা মাফ করিয়ে নেয়, সেই দিন আসার পূর্বে, যেদিন তার নিকটে দিরহাম ও দীনার কিছুই থাকবে না। সেদিন যদি তার কোন নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুম পরিমাণ নেকী সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার কাছে নেকী না থাকে, তবে মযলূম ব্যক্তির পাপসমূহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে'[বুখারী]

২. হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমার উপরে (মি'রাজে বা স্বপ্নে) জাহান্নামকে হাযির করা হয়। তাতে আমি বনু ইস্রাঈলের একজন মহিলাকে দেখলাম যাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেওয়া হচ্ছে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। তাকে খেতেও দেয়নি, ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনে বিচরণ করে পোকা-মাকড় ইত্যাদি খেতে পারে। অবশেষে বিড়ালটি ক্ষুধায় মারা যায়। তাছাড়া আমি সেখানে আমর ইবনু আমের আল-খুযাঈকে দেখলাম। সে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে নিজের নাড়ি-ভুঁড়ি টেনে চলেছে। এ ব্যক্তিই সর্বপ্রথম দেব-দেবীর নামে ষাঁড় ছেড়ে দেয়ার কুপ্রথা চালু করেছিল'।[মুসলিম]

ইনি হলেন বনু খুযা'আর নেতা আমর বিন লুহাই বিন আমের, যিনি প্রথম শাম (সিরিয়া) থেকে 'হোবল' মূর্তি কিনে এনে কা'বা গৃহে স্থাপন করেন এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর একেশ্বরবাদী দ্বীনের মধ্যে মূর্তিপূজার শিরকের প্রবর্তন করেন।

৩. হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। যাতে আগুনে পুড়ে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং গাধা যেমন গম পেষার সময় ঘানির চারপাশে ঘুরতে থাকে, অনুরূপভাবে সেও তার নাড়ি-ভুঁড়ির চারপাশে ঘুরতে থাকবে। এ সময় জাহান্নামবাসীরা সেখানে জমা হয়ে জিজ্ঞেস করবে, হে অমুক! তোমার ব্যাপার কি? তুমি না আমাদের সৎকাজের আদেশ করতে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করতে? জবাবে সে বলবে, আমি তোমাদের সৎকাজের আদেশ করতাম। কিন্তু আমি নিজে তা করতাম

না। আর তোমাদেরকে অন্যায় কাজে নিষেধ করতাম। কিন্তু আমি নিজে তা করতাম'[বুখারী]

مَثَلُ৪. হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,
الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرَقُ
ُ 'যে আলেম মানুষকে সৎকর্ম শিক্ষা দেয় এবং নিজে সেটা ভুলে যায়, نَفْسَه
তার তুলনা ঐ প্রদীপের মত যা মানুষকে আলো দেয়, অথচ নিজে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়'।[ত্বাবারানী] অর্থাৎ আমলহীন আলেম জাহান্নামী হবে।

৫. হযরত সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। একদিন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে আজ কেউ স্বপ্ন দেখেছ কি? কেননা আমাদের কেউ এরূপ দেখে থাকলে তা বর্ণনা করত এবং তিনি আল্লাহ যা চাইতেন সে অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে দিতেন। যথারীতি একদিন (ফজর ছালাত শেষে) তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ আজ কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি যে, দু'জন ব্যক্তি আমার নিকটে আসল। অতঃপর তারা আমাকে পবিত্র ভূমির (শাম বা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের) দিকে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখলাম (১) একজন ব্যক্তি বসে আছে এবং অপর ব্যক্তি একমুখ বাঁকানো ধারালো লোহার সাঁড়াশী হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে উক্ত বসা ব্যক্তির গালের এক পাশ দিয়ে ওটা ঢুকিয়ে দিয়ে ঘাড়ের পিছন পর্যন্ত চিরে দিচ্ছে। অতঃপর গালের অপর পার্শ্ব দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘাড়ের পিছন পর্যন্ত চিরে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে গালের প্রথমাংশটি ভাল হয়ে যায়। তখন আবার সে তাই-ই করে (এই ভাবে একবার এগাল একবার ওগাল চিরতে থাকে)। আমি বললাম এটা কি? তারা দু'জন বলল, সামনে চল। (২) অতঃপর আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে পৌঁছলাম, যে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। অপর ব্যক্তি একটা ভারি পাথর নিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে ঐ পাথর ছুঁড়ে শায়িত ব্যক্তির মাথা চূর্ণ করে দিচ্ছে। অতঃপর পাথরটি দূরে গড়িয়ে যায়। তখন লোকটি পাথরটি কুড়িয়ে আনতে যায়। ইতিমধ্যে তার মাথা পূর্বের ন্যায়

ঠিক হয়ে যায়। তখন পুনরায় সে পাথর ছুঁড়ে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা বলল, সামনে চল।

(৩) আমরা সামনের দিকে চললাম। অবশেষে একটা গর্তের নিকটে এলাম। যা ছিল বড় একটা চুলার মত। যার উপরাংশ সংকীর্ণ এবং নীচের অংশ প্রশস্ত। যার তলদেশে আগুন জ্বলছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরে উঠত, তখন তার ভিতরে যারা আছে, তারাও উপরের দিকে উঠে আসত এবং তারা গর্ত থেকে বাইরে ছিটকে পড়ার উপক্রম হ'ত। আবার যখন আগুন নীচে নামত, তখন তারাও নীচে নেমে যেত। এর মধ্যে ছিল একদল উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা বলল, সামনে চল।

(৪) অতঃপর আমরা অগ্রসর হয়ে একটা রক্তের নদীর কিনারে এসে পৌঁছলাম। দেখলাম নদীর মাঝখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে ও নদীর কিনারে একজন দাঁড়িয়ে। যার সামনে রয়েছে একটি পাথরের খন্ড। অতঃপর নদীর মধ্যের লোকটি যখনই তীরে ওঠার জন্য অগ্রসর হচ্ছে, তখনই তীরে দাঁড়ানো লোকটি তার চেহারা লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারছে। ফলে লোকটি আবার সেখানে ফিরে যাচ্ছে, যেখানে সে পূর্বে ছিল। এভাবে যখনই লোকটি তীরের দিকে আসার চেষ্টা করে, তখনই কিনারে দাঁড়ানো লোকটি তার মুখের উপর পাথর মেরে তাকে পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে দেয় যেখানে সে ছিল। আমি বললাম, এটা কি? তারা বলল, সামনে চল।

... অতঃপর তারা আমাকে ব্যাখ্যা দিল যে, (১) প্রথম ব্যক্তি যাকে সাঁড়াশী দিয়ে গাল চেরা হচ্ছিল, ওটা হ'ল মিথ্যাবাদী। তার কাছ থেকে মিথ্যা রটনা করা হ'ত। এমনকি তা সর্বত্র পৌঁছে যেত। ফলে তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত (কবরে) ঐরূপ আচরণ করা হবে, যা তুমি দেখেছ। (২) যে ব্যক্তির মাথা পাথর ছুঁড়ে চূর্ণ করা হচ্ছে, ওটা হ'ল সেই ব্যক্তি, আল্লাহ যাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন। অতঃপর সে কুরআন থেকে গাফেল হয়ে রাত্রে ঘুমাতো এবং দিনেও সে অনুযায়ী আমল করত না। অতএব তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত (কবরে) ঐরূপ আচরণ করা হবে, যা তুমি দেখেছ। (৩) আগুনের চুলার গর্তে তুমি যাদের দেখেছ, ওরা হ'ল যেনাকার। আর (৪) রক্তের নদীর মধ্যে তুমি

যাদের দেখেছ, ওরা হ’ল সূদখোর’। ... আর আমি হ’লাম জিবরীল এবং ইনি হ’লেন মীকাঈল’।[বুখারী]

৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, পিতা-মাতার অবাধ্য (অর্থাৎ তাদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী) সন্তান, জুয়াড়ি, উপকার করে খোঁটা দানকারী ও নিয়মিত মদ্যপানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না’ [মিশকাত]তাদেরকে ‘ত্বীনাতুল খাবাল’ নামক জাহান্নামীদের দেহনিঃসৃত রক্ত ও পুঁজের দুর্গন্ধময় নদী থেকে পান করানো হবে’।[তিরমিযী]

৪.ছগীরা গোনাহ সমূহ পরিত্যাগ করা :

ছগীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কষ্টকর। কিন্তু এটা করলে তা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। কেননা ছগীরা গোনাহ মানুষকে কবীরা গোনাহের দিকে ধাবিত করে। বিশেষ করে যৌন বিষয়ে, নেশাকর বস্তু বিষয়ে এবং অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন বিষয়ে এক পা বাড়ালেই তা চুম্বকের মত মানুষকে দ্রুত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। অতএব এসবের সামান্যতম সুড়সুড়ি পেলেই ওটাকে শয়তানী ধোঁকা মনে করে বাম দিকে তিনবার থুক মেরে *আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজীম* বলে ছুটে পালাতে হবে। যুক্তি-তর্কের কবলে পড়লেই শয়তানের ফাঁদে আটকে যেতে হবে। অতএব খালেছ তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে ও সকল ব্যাপারে তাঁর উপরেই ভরসা করতে হবে। নিজেকে পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে সঁপে দিতে হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ কখনোই তাঁর উপরে নির্ভরশীল বান্দার কোন অমঙ্গল করেন না। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হন’ *(তালাক ৬৫/৩)*। মনে রাখতে হবে, ছগীরা গোনাহ বারবার করলে তা কবীরা গোনাহে পরিণত হয়ে যায়। যা তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। বলা হয়ে থাকে, لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار ‘ছগীরা গোনাহ বারবার করলে তা ছগীরা থাকে না এবং তওবা করলে আর কবীরা থাকে না’। কবি ইবনুল মু‘তায বলেন, لاَ تُحْقِرَنَّ صَغِيْرَةً + إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى ‘ছোট গোনাহকে তুচ্ছ মনে করো না। নিশ্চয়ই পাহাড় গড়ে কংকর দ্বারা’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا ‘হে আয়েশা! তুচ্ছ গোনাহ থেকেও

বেঁচে থাকো। কেননা উক্ত পাপগুলির খোঁজ রাখার জন্য আল্লাহর পক্ষ হ'তে অনুসন্ধানকারী (ফেরেশতা) নিযুক্ত রয়েছে'[ইবনু মাজাহ]

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِىَ أَدَقُّ فِى أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُوبِقَاتِ '(হে লোকসকল!) তোমরা এমনামন কাজ করে থাক, যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চাইতে সূক্ষ্ম। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় আমরা সেগুলিকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম'।[বুখারী]

৫. সর্বদা কবর ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করা :

(ক) হযরত ওছমান গণী (রাঃ) কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতেন। তাতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তাঁকে বলা হ'ল, জান্নাত ও জাহান্নামের স্মরণে আপনি কাঁদেন না। অথচ এ থেকে কাঁদেন। জবাবে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ- قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صـ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْه 'নিশ্চয়ই কবর হ'ল আখেরাতের মনযিল সমূহের প্রথম মনযিল। যদি কেউ এখানে মুক্তি পায়, তাহ'লে পরবর্তীগুলি তার জন্য অধিকতর সহজ হয়ে যাবে। আর যদি এখানে মুক্তি না পায়, তাহ'লে এর পরেরগুলি অধিকতর কঠিন হবে'। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি কবরের চাইতে ভয়ংকর কোন দৃশ্য দেখিনি'।[তিরমিযী]

(খ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّات 'তোমরা স্বাদসমূহ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করো'।[তিরমিযী]

(গ) আল্লাহ বলেন, وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا- ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে ওটা (পুলছিরাত) অতিক্রম করবে না। আর এটি তোমার প্রতিপালকের অমোঘ সিদ্ধান্ত'। 'অতঃপর আমরা মুত্তাক্বীদের সেখান থেকে উদ্ধার করব এবং যালেমদের নতজানু অবস্থায় তার মধ্যে রেখে দেব' *(মারিয়াম ১৯/৭১-৭২)*।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জাহান্নামের উপর পুলছিলাত স্থাপন করা হবে। অতঃপর আমিই রাসূলগণের মধ্যে প্রথম যিনি তার উম্মতকে নিয়ে পুলছিরাত অতিক্রম করবেন। আর সেদিন নবীগণ ব্যতীত কেউ কথা বলবেন না। তারা কেবল বলবেন, হে আল্লাহ! রক্ষা কর! রক্ষা কর! সা'দান কাঁটার ন্যায় জাহান্নামের আংটাসমূহ থাকবে। সেগুলি যে কত বড় বড় তা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেন না। ঐ আংটাগুলি মানুষকে ধরে নিবে তাদের আমল অনুযায়ী। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ ধ্বংস হবে, কেউ শাস্তিতে পিষ্ট হবে। অতঃপর মুক্তি পাবে'।[মিশকাত] ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মানুষ জাহান্নামের কিনারায় আসবে। অতঃপর সেখান থেকে তাদের আমল অনুযায়ী মুক্তি পাবে। কেউ চোখের পলকে পুলছিরাত পার হয়ে যাবে। কেউ বাতাসের গতিতে বেরিয়ে যাবে। কেউ ঘোড়দৌড়ের গতিতে, কেউ সাধারণ আরোহীর গতিতে। কেউ পায়ে চলার গতিতে অতিক্রম করবে'।[তিরমিযী]

ইবনু আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একদা খারেজী নেতা নাফে' বিন আযরাক্বকে বলেন, আমি ও তুমি অবশ্যই পুলছিরাতে হাযির হব। অতঃপর আল্লাহ আমাকে সেখান থেকে নাজাত দিবেন। কিন্তু তুমি! আমি বিশ্বাস করি না যে, আল্লাহ তোমাকে নাজাত দিবেন। কেননা তুমি এটা মিথ্যা মনে করে থাক *(কুরতুবী)*। মু'তা যুদ্ধের অন্যতম সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) যুদ্ধে যাওয়ার আগে কাঁদতে কাঁদতে অত্র আয়াতটি পাঠ করে বলেন, لا أدري أنجو منها أم لا؟ 'আমি জানি না পুলছিরাত থেকে আমি মুক্তি পাব কি-না' *(ইবনু কাছীর)*। অতএব হে মানুষ! মৃত্যু ও জাহান্নামকে ভয় করো।

৬. সর্বদা আখেরাতকে স্মরণ করা :

আল্লাহ বলেন, أَلاَ يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُوْنَ- لِيَوْمٍ عَظِيمٍ- يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ 'তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে'। 'সেই

মহা দিবসে’? ‘যেদিন সকল মানুষ জগত সমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে দন্ডায়মান হবে’? *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/৪-৬)*। এই আয়াত পর্যন্ত এসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর ক্বিরাআত বন্ধ হয়ে যেত এবং তিনি ক্রন্দন করতেন। অতঃপর কিয়ামতের দিনের ভয়ংকর অবস্থা সম্বলিত হাদীছ শুনাতেন। তাছাড়া তিনি বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সাবধান করতেন *(কুরতুবী)*। আল্লাহ বলেন, بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا- وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ‘বস্ত্ততঃ তোমরা দুনিয়াবী জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক’। ‘অথচ আখেরাত হ’ল উত্তম ও চিরস্থায়ী’ *(আ‘লা ৮৭/১৬-১৭)*। তিনি বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ‘যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে, আমরা তার ফসল বৃদ্ধি করে দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমরা তাকে সেখান থেকে কিছু দেই। কিন্তু আখেরাতে তার জন্য কোনই অংশ থাকবে না’ *(শূরা ৪২/২০)*।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় আনছারদের জনৈক ব্যক্তি এসে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন মুমিন সর্বোত্তম? তিনি বললেন, أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا সর্বাধিক চরিত্রবান ব্যক্তি। অতঃপর জিজ্ঞেস করল, কোন ব্যক্তি সবচেয়ে বিচক্ষণ? তিনি বললেন, أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الأَكْيَاس ‘মৃত্যুকে সর্বাধিক স্মরণকারী এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য সুন্দরতম প্রস্ত্ততি গ্রহণকারী। মূলতঃ তারাই হ’ল বিচক্ষণ ব্যক্তি’।[ইবনু মাজাহ] এরপরেও সর্বদা আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে। কেননা তাঁর রহমত ভিন্ন নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখা যাবে না।

উপরোক্ত উপায় সমূহ অবলম্বন করলে মুমিনগণ তাদের অন্তরজগতকে কলুষমুক্ত রাখতে পারবেন বলে আশা করা যায়। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

আত্মশুদ্ধির উপায় ও অনুশীলন:

১.গোনাহের প্রতিবিধান তওবায়

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃত গোনাহের প্রতিবিধান সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন—

وَ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

যে কেউ কোনো মন্দ কাজ করবে অথবা নিজের প্রতি জুলুম করবে, তারপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে— সে আল্লাহকে পাবে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। —সূরা নিসা (৪) : ১১০

এখানে মন্দ কাজ তথা ছোট ছোট গোনাহ এবং নিজের প্রতি জুলুম তথা বড় ধরনের গোনাহÑ উভয়টির ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার কথা। বলা হয়েছে, ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহকে পাবে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ বান্দা কোনো ভুল, অপরাধ বা সীমালঙ্ঘন করলেও তার প্রতি তিনি অত্যন্ত দয়ার আচরণ করেন। ক্ষমাগুণ প্রকাশ করেন। তাই দৃঢ় আশা করা যায় যে, তিনি বান্দাকে ক্ষমা করে দেবেন।

বাস্তবে সুস্থ বিবেকের অধিকারী কোনো মানুষই চায় না খারাপ হতে। চায় না মন্দ কাজ করতে কিংবা অপরাধী হতে। কিন্তু মানুষের স্বভাবজাত দুর্বলতা, আত্মনিয়ন্ত্রণে শিথিলতা এবং নফস ও শয়তানের প্রবঞ্চনা তাকে এসবে লিপ্ত করে ফেলে। তাছাড়া দুনিয়া যেহেতু পরীক্ষার জায়গা, এখানে ভালো ও মন্দ উভয় কাজের শক্তি দিয়ে মানুষকে পাঠানো হয়েছে। এরপর ভালো ও নেক কাজে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। মন্দ ও গোনাহের কাজে ঘোষণা করা হয়েছে শাস্তি। সেই শাস্তি থেকেই বাঁচার উপায় হল তাওবা ও ইস্তিগফার।

অন্য একটি আয়াতে আরও উদার-ব্যপ্ত ঘোষণা এসেছে। এসেছে অভয় ও আশ্বাসবাণী। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓي اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْم.ُ

আপনি বলে দিন, হে আমার সেই বান্দারা! যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ! আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। —সূরা যুমার (৩৯) : ৫৩

গোনাহ হয়ে গেছে! নিজের প্রতি অবিচার করেছ! সীমালঙ্ঘন করেছ! তবু নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এমন অভয় ও আশ্বাসবাণী পাওয়ার পর একজন মুমিনের হৃদয়ে কী আস্থা ও শক্তি অনুভূত হয় তা খুব সহজেই অনুমেয়।

তাওবার প্রতি উৎসাহ এবং ইস্তিগফারের ফায়েদা

শুধু তাই নয়। তাওবা ও ইস্তিগফারের প্রতি তিনি আলাদাভাবেও উৎসাহ দিয়েছেন। নির্দেশ করেছেন ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে। ইরশাদ হয়েছে—

وَ سَارِعُوْٓا اِلٰي مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ.

এবং দ্রুত অগ্রসর হও তোমার রবের ক্ষমার দিকে এবং জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমানসমূহ ও যমীনের (প্রশস্ততার) ন্যায়। যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। —সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৩৩

অর্থাৎ যদি আল্লাহ তাআলার ক্ষমা লাভ করতে পার এবং যদি আল্লাহ তাআলার দয়া ও মেহেরবানী জুটে যায় তাহলে সেই জান্নাত পেতে পার, যার প্রশস্ততা আসমানসমূহ ও যমীনের (প্রশস্ততার) ন্যায়। যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। মোটকথা, আল্লাহর ক্ষমা লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল তাওবা। আর সেটি তো মুত্তাকীদেরই পরিচয়-বৈশিষ্ট্য।

তাওবা-ইস্তিগফারের বিভিন্ন ফায়েদার কথাও উল্লেখিত হয়েছে কুরআন মাজীদে। যেমন হযরত নূহ আলাইহিস সালামের ভাষায় ইরশাদ হয়েছে—

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا، يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا، يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ يَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا.

আমি বলেছি, তোমরা আপন রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ করবেন। তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন উদ্যানরাজি আর তোমাদের জন্য প্রবাহিত করবেন নদ-নদী। —সূরা নূহ (৭১) : ১০-১২

অর্থাৎ ইস্তিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনার ফলে এইসব বিষয় লাভ হবে। আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন। আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ করবেন এবং বাগ-বাগিচা ও নদ-নদীর ব্যবস্থা করে দেবেন।

স্পষ্ট কথা যে, এগুলোর প্রত্যেকটিই এমন, যা ছাড়া মানুষের জীবন ও জগৎ প্রায় অচল। সেগুলোই খুব সহজে লাভ হতে পারে ইস্তিগফারের মাধ্যমে।

২.সলাত এবং তিলাওয়াতের মাধ্যমে আত্মার প্রশান্তি:

কুরআন বলেছে:

“নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।”

— (সূরা আনকাবূত, ২৯:৪৫)

চর্চা:

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যথাসময়ে আদায়

প্রতিদিন অন্তত ১ রুকু কুরআন তিলাওয়াত

৩.যিকির ও মুরাকাবা:

আল্লাহর স্মরণই অন্তরের পরিশুদ্ধি। কুরআন বলে:

“যারা আল্লাহকে স্মরণ করে, তাদের অন্তর প্রশান্তিতে থাকে।”

— (সূরা রা’দ, ১৩:২৮)

চর্চা:

সকাল-সন্ধ্যার যিকির

নির্জনে বসে অন্তরের একাগ্রতা নিয়ে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” পড়া

মুরাকাবা: আল্লাহ আমাকে দেখছেন—এই অনুভবে কিছু সময় নিরব ধ্যান

৪.নিয়তের বিশুদ্ধতা ও আত্মসমালোচনা :

নিয়ত বিশুদ্ধ না হলে আমল কবুল হয় না। এজন্য প্রতিনিয়ত নিজের নিয়ত পরীক্ষা করা জরুরি।

চর্চা:

দিন শেষে আত্মসমালোচনা: "আজ আমি কারো সাথে অন্যায় করলাম কি?"

সপ্তাহে একদিন নিরিবিলিতে নিজের অবস্থার হিসাব নেওয়া

৫. রোযা ও সংযোমের মাধ্যমে নফস নিয়ন্ত্রণ :

রোজা আত্মাকে সংযত করে। রাসূল (সা.) বলেন:

"রোজা হচ্ছে ঢালস্বরূপ।"

— (বুখারী)

চর্চা:

নফল রোজা (যেমন: সোমবার ও বৃহস্পতিবার)

কম খাওয়া, কম ঘুম এবং কম কথা বলা

৬. নেক লোকদের সংস্পর্শ ও দ্বীনি মজলিসে অংশগ্রহণ :

আল্লাহর ভালো বান্দাদের সাহচর্যে থাকলে আত্মশুদ্ধির অনুপ্রেরণা আসে।

চর্চা:

দ্বীনি বয়ানে অংশ নেওয়া

নেককার বন্ধু বেছে নেওয়া

সুফিবাদী বুযূর্গ বা পীরের সোহবতে কিছু সময় কাটানো

আত্মশুদ্ধির সুফল ও সমাজে এর প্রভাব:

আত্মশুদ্ধি শুধুমাত্র ব্যক্তি পর্যায়ে নয়, বরং সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র—সবক্ষেত্রেই গভীর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। একজন আত্মশুদ্ধ মানুষ শুধু নিজেকে নয়, সমাজকেও আলোকিত করে তোলে। আত্মশুদ্ধির সুফল বিভিন্ন স্তরে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

১. ব্যক্তি জীবনে আত্মশুদ্ধির সুফল

আল্লাহর নৈকট্য অর্জন: আত্মা শুদ্ধ হলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ সহজ হয়।
আত্মশান্তি ও তৃপ্তি: অন্তরের রোগ দূর হলে অন্তরে প্রশান্তি আসে, যা কুরআনে বলা হয়েছে:
"যারা আল্লাহকে স্মরণ করে, তাদের অন্তর প্রশান্তিতে থাকে।" — (সূরা রা'দ, ১৩:২৮)
সৎ চরিত্রের বিকাশ: আত্মশুদ্ধ ব্যক্তি কখনও অসৎ আচরণ করতে পারে না।
নিয়ত ও আমলের বিশুদ্ধতা: তার প্রতিটি কাজ হয় ইখলাসপূর্ণ এবং সুন্নাহ অনুযায়ী।

২. পারিবারিক জীবনে প্রভাব
পরস্পরের প্রতি সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পায়
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ গড়ে ওঠে
সন্তানদের নৈতিক শিক্ষা ও দ্বীনী পরিবেশ নিশ্চিত হয়

৩. সামাজিক প্রভাব
ন্যায় ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে ওঠে
জুলুম, দুর্নীতি, হিংসা, হানাহানি কমে যায়
মানবিকতা ও নৈতিকতা বৃদ্ধি পায়
ধর্মীয় সহনশীলতা ও পরস্পরের প্রতি দয়া বাড়ে

৪. আত্মশুদ্ধি ব্যক্তি সমাজের জন্য রহমত
রাসূল (সা.) বলেন:
"আল্লাহর কিছু এমন বান্দা আছেন, যাদের কারণে মানুষ বৃষ্টি পায়, নিরাপদে থাকে, এবং তাদের দু'আর কারণে বিপদ দূর হয়।"
— (মুসনাদে আহমাদ)

৫. উম্মাহর পুনরুত্থানে আত্মশুদ্ধির ভূমিকা

উম্মাহর নবজাগরণ, নেতৃত্ব এবং বিজয় তখনই সম্ভব, যখন অন্তরসমূহ পবিত্র হয়, নিয়ত বিশুদ্ধ হয় এবং চরিত্র হয় রাসূল (সা.)-এর আদর্শে গঠিত। আত্মশুদ্ধিই ইসলামী জাগরণের মূল চাবিকাঠি।

আধুনিক জীবনে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক জীবনে প্রযুক্তির প্রভাব, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, সময়ের অভাব এবং চারপাশের অপসংস্কৃতির চাপ মানুষকে ধীরে ধীরে আত্মিক দিক থেকে দুর্বল করে দিচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে আত্মশুদ্ধি ইসলামী জীবনধারার অপরিহার্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১. নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতিকারে আত্মশুদ্ধি

আল্লাহ বলেন,

"নিশ্চয়ই সফল সেই ব্যক্তি, যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে; আর ধ্বংস হয়েছে সে, যে একে কলুষিত করেছে।"

(সূরা আশ-শামস: ৯-১০)

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে আত্মশুদ্ধি না থাকলে ধ্বংস অনিবার্য। মিথ্যা, প্রতারণা ও অসদাচরণ থেকে আত্মাকে রক্ষা করতে না পারলে ব্যক্তি ও সমাজ ধ্বংসের পথে যায়।

২. মানসিক প্রশান্তি অর্জনে আত্মশুদ্ধি

আল্লাহ বলেন,

"নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।"

(সূরা রা'দ: ২৮)

আত্মশুদ্ধির অন্যতম উপায় হলো আল্লাহর স্মরণ, যা একমাত্র প্রকৃত মানসিক প্রশান্তি দিতে পারে। আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা ও মানসিক চাপ থেকে মুক্তির জন্য এটি একটি চাবিকাঠি।

৩. আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদার উন্নয়নে আত্মশুদ্ধি

পবিত্র হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কেয়ামতের দিনে বিশ্বাস করে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে।"

(বুখারী: ৬০১৮, মুসলিম: ৪৭)

এটি আত্মশুদ্ধির একটি দিক নির্দেশ করে — মানুষ যেন নিজের জবান ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। একজন আত্মপরিশুদ্ধ ব্যক্তি নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে আত্মমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

৪. সামাজিক স্থিতিশীলতায় আত্মশুদ্ধির ভূমিকা

রাসূল (সা.) বলেন,

"মুসলমান সে, যার জবান ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।"

(সহীহ বুখারী: ১০)

একজন আত্মশুদ্ধ ব্যক্তি সমাজে শান্তি ও সহনশীলতার প্রতীক হয়ে ওঠে। তার দ্বারা অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, বরং সে ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেয়।

৫. ইসলামের প্রকৃত আদর্শ অনুসরণের জন্য

আল্লাহ বলেন,

"নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।"

(সূরা আহযাব: ২১)

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে একজন মানুষ রাসূল (সা.)-এর চরিত্র ও আদর্শ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, যা ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরে।

৬. প্রযুক্তির প্রভাবে সৃষ্ট ফিতনা থেকে আত্মরক্ষায় আত্মশুদ্ধি

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

"ফিতনা সৃষ্টি হবে রাতের অন্ধকার অংশের মত—মানুষ তখন সকালে মুমিন থাকবে, আর সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে।"
(মুসলিম: ১১৮)
এই হাদীস প্রযুক্তির যুগে আমাদের বাস্তবতার সঙ্গে গভীরভাবে মিল রাখে। আত্মশুদ্ধিই ফিতনার যুগে ঈমান ধরে রাখার অবলম্বন।

আত্মশুদ্ধি ও আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে মুক্তি

আত্মশুদ্ধির পথে সবচেয়ে সূক্ষ্ম কিন্তু ভয়ংকর প্রতিবন্ধকতা হলো আত্মপ্রবঞ্চনা (غرور النفس)—যেখানে মানুষ নিজেকেই পরিপূর্ণ মনে করতে শুরু করে। কেউ যখন মনে করে, "আমি ভালো, আমি অন্যদের চেয়ে উত্তম, আমার আর সংশোধনের প্রয়োজন নেই" –তখন তার আত্মিক উন্নয়ন স্থবির হয়ে পড়ে। এই গোপন অহংকারই আত্মশুদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ শত্রু।
ইবলিস আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হয়ে আদম (আ.)-কে অবজ্ঞা করেছিল। সে বলেছিল, "আমি তাকে অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো, আর তাকে সৃষ্টি করেছো মাটি থেকে।" (সূরা আ 'রাফ: ১২)। এখানেই বোঝা যায়, আত্মশুদ্ধির বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করেছিল অহংকারপূর্ণ আত্মা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) হুঁশিয়ার করে বলেন:
"যে ব্যক্তি হৃদয়ে এক কণাও অহংকার ধারণ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"
(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৯১)
এই ব্যাপারে ইসলামি মনীষীরাও গভীর দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন।

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) বলেন:

“আত্মপ্রবঞ্চনার সবচেয়ে বড় রূপ হলো—একজন মানুষ যখন নিজের অন্তরকে পবিত্র মনে করে, অথচ তার ভেতর অহংকার, রিয়া ও লোভ গোপনে বাসা বাঁধে।”
(ইহ্যাউ উলুমুদ্দীন)

হজরত আলী (রা.) বলেন:

“সবচেয়ে ভয়ংকর ফিতনা হলো, তুমি নিজেকে অন্যদের চেয়ে উত্তম মনে করো।”

আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একজন মুমিনকে প্রতিনিয়ত নিজের ভুল, দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা ও পাপ স্মরণ করতে হয়। তাঁকে আল্লাহর দরবারে নিজের অক্ষমতা ও অপ্রতুলতা স্বীকার করতে হয়। এই বিনয়ই তাকে সত্যিকার অর্থে আত্মশুদ্ধির পথে অগ্রসর করে।
আত্মশুদ্ধি মানেই হচ্ছে প্রতিনিয়ত নিজের ভেতরের দম্ভ, আত্মতৃপ্তি, আত্মবিশ্বাসের মোহভঙ্গ করা এবং নিজেকে সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা। আত্মপ্রবঞ্চনার দেয়াল না ভাঙলে আত্মার দরজা খুলে না। তাই, আত্মশুদ্ধির পথে প্রথম কাজই হলো—নিজেকে প্রশ্ন করা: “আমি কি সত্যিই শুদ্ধ, না কেবল নিজেকে শুদ্ধ ভাবছি?”

আত্মশুদ্ধি ও ইখলাসপূর্ণ আমল

আত্মশুদ্ধির একটি প্রধান স্তম্ভ হলো ইখলাস (إخلاص)—অর্থাৎ একান্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করা। বাহ্যিক আমল যতই সুন্দর হোক না কেন, যদি তার ভিতরে ইখলাস না থাকে, তবে তা আত্মাকে শুদ্ধ করে না; বরং তা রিয়া (লোক দেখানো) হয়ে দাঁড়ায়, যা আত্মাকে আরও কলুষিত করে তোলে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"তাদেরকে শুধু এই আদেশই দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন একনিষ্ঠভাবে (مخلصين) তাঁর ইবাদত করে।"
(সূরা বাইয়্যিনাহ: ৫)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"নিশ্চয়ই সব কাজ নিয়তের উপর নির্ভর করে, আর প্রতিটি মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে।"
(সহীহ বুখারী, হাদীস: ১)

এই হাদীস বোঝায়, আমলের বাহ্যিক রূপ নয়—বরং নিয়তই নির্ধারণ করে তা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা। যে ব্যক্তি মানুষের প্রশংসার জন্য দান করে, ইবাদত করে, জ্ঞান চর্চা করে—তার আত্মা আসলে শুদ্ধ হয় না। বরং সে আত্মপ্রবঞ্চনা ও গোপন অহংকারে আক্রান্ত হয়।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন:

"ইখলাস এমন একটি গোপন জিনিস, যা ফেরেশতারাও লিখতে পারে না, শয়তানও নষ্ট করতে পারে না, আর লোক দেখানো মানুষও তা অনুকরণ করতে পারে না।"

একজন আত্মশুদ্ধ মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো—সে তার প্রতিটি কাজ, কথাবার্তা, উপকার-অপকার এমনকি হাসিমুখেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত স্থির রাখে। তার দৃষ্টি থাকে মানুষের দিকে নয়, বরং আল্লাহর দিকে। এই ইখলাসই ধীরে ধীরে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে তোলে।

আত্মশুদ্ধি ও দোয়ার প্রভাব

আত্মশুদ্ধির পথে দোয়া একটি অদৃশ্য কিন্তু গভীর প্রভাববিস্তারকারী মাধ্যম। দোয়া শুধু চাওয়া নয়—এটি বান্দার আত্মা ও আল্লাহর মাঝে এক গোপন সম্পর্কের সেতুবন্ধন। আত্মশুদ্ধি কামনাকারী ব্যক্তি তার পাপ, দুর্বলতা, লোভ, হিংসা ও অহংকার থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে আত্মসমর্পণ করে। এই আত্মসমর্পণই তাকে বিনয়ী করে, হৃদয়কে কোমল করে এবং এক নতুন জাগরণের পথ খুলে দেয়।

কুরআনে হযরত ইব্রাহিম (আ.) দোয়া করেছেন:
"হে আমার পালনকর্তা! আমাকে নামাজ কায়েমকারী রাখুন এবং আমার সন্তানদেরও।" (সূরা ইবরাহিম: ৪০)
এই দোয়া আত্মশুদ্ধির এক মৌলিক দিক নির্দেশ করে—ইবাদতের মাধ্যমে আত্মার প্রশান্তি অর্জন।

রাসূল (সা.) আত্মশুদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া করতেন:
"হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করো, তুমি তো তা পরিশুদ্ধ করতে পারো। তুমি ছাড়া আর কেউ এর রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে না।"
(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৭২২)

আরেকটি হাদীসে এসেছে,
"দোয়া ইবাদতের মূল।" (সুনান তিরমিজি, হাদীস: ৩৩৭১)
অর্থাৎ, দোয়া কেবল আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া নয়, বরং আত্মিক পরিশুদ্ধির একটি প্রধান উপায়। নিয়মিত দোয়া মানুষকে আত্মসমালোচনায় অভ্যস্ত করে, আল্লাহর স্মরণে স্থির রাখে এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে।

সুতরাং, আত্মশুদ্ধির জন্য দোয়া শুধু সহায়ক নয়—এটি এক অবিচ্ছেদ্য অনুশীলন, যা হৃদয়ের আঁধার দূর করে আলোর স্পর্শ এনে দেয়।

উপসংহারঃ

আত্মশুদ্ধি কোনো বিলাসিতা নয়, এটি একজন মুমিনের জীবনের অপরিহার্য অংশ। কুরআন ও হাদীস আমাদের প্রতিনিয়ত আহ্বান করছে অন্তর পরিশুদ্ধ করার পথে। সাহাবী, তাবেয়ীন ও বুযূর্গদের জীবন আমাদের সামনে এক উজ্জ্বল আদর্শ।

আসুন, আমরা নিজেরা আত্মশুদ্ধির পথে অগ্রসর হই এবং সমাজকে আল্লাহভীতির আলোয় আলোকিত করি।

গ্রন্থপঞ্জী :

তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধি, আত্মশুদ্ধি, আত্মার ব্যাধি ও প্রতিকার,রূহের খোরাক,মাসিক আত তাহরিক,মাসিক আল কাউসার,দৈনিক আজাদী